দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

নতুন সময়সূচী ও শিক্ষা প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ আলমগীর কবির পাটওয়ারী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিপত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নির্ধারিত হওয়ায় কর্মরত সকল শিক্ষক/কর্মচারীদের ঠিক সময় পর্যন্ত উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বলা হয়েছে এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসারগণ আকস্মিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে অনুপস্থিত শিক্ষক/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এখানে রুটিনে ক্লাস থাকুক বা না থাকুক, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক অর্পিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রাসঙ্গিক কাজ থাকুক বা না থাকুক সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কর্মরত সকল শিক্ষক কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয়ে বাধ্যবাধকতার এ নীতি প্রকৃত শিক্ষা কার্যক্রমের পরিপন্থী।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকদের এভাবে ধরে বেঁধে আটকে রেখে শিক্ষকতা হবে না। প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পাশাপাশি একজন শিক্ষক ক্লাস করেন, পরবর্তী ক্লাসের প্রস্তুতি নেন, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করেন, খাতা কাটেন, ফলাফল প্রকাশসহ নানা ধরনের কাজ করেন এবং করতেই হয়। এতে প্রতিষ্ঠান প্রধান যাকে যে কাজের যোগ্য মনে করেন কিংবা যাদেরকে শিক্ষকগণ মনোনীত করেন তারাতো ১০টা-৪টাই শুধু নয়, যতটা সময় দেয়া প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ আগে-পরে ততটাই সময় দিচ্ছেন। কেউ কেউ না দিতে চাইলেও তাকে দিতে হয়। শিক্ষকরা কাজ না করলে প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার এতো কাজ সম্পাদিত হয় কি করে? কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিকাল ৪টার পর থেকে পরবর্তী দিন সকাল ১০টার পূর্বে কে দায়িত্ব পালন করবে? প্রতিষ্ঠান প্রধানগণতো তাদেরকে দিয়ে ২৪ ঘন্টার রুটিন করে কাজ চালান। আসলে শিক্ষক/কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রেরণা দিয়ে সময়ে-অসময়ে যেভাবে দায়িত্ব পালন করাচ্ছেন তা-ই হচ্ছে।

শিক্ষকতা কোন গদবাঁধা কাজ নয়। একজন প্রকৃত শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে ছাত্রদের প্রতিও দৃষ্টি রেখে ক্লাসের নির্ধারিত সময়ের বাইরে পরিশ্রম করে পাঠ পরিকল্পনা এবং পাঠ তৈরী করে ক্লাসে গিয়ে বিভিন্ন কৌশলে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আকর্ষণ বা মনোযোগ সৃষ্টি করে পাঠদান করতে হয়।

কাজেই এরূপ আইনীভাবে নয়। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা এবং উৎসাহব্যঞ্জক মনোভাবাপন্ন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হলেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব। এমতাবস্থায় কতিপয় প্রস্তাবনা :

১। শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ও প্রাসঙ্গিক সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য ভাল কিছু চাইলে শিক্ষকদেরকে নিশ্চিন্তে চালানোর মত স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ও আনুষঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ বাজেটে স্কুল, কলেজের ৮৫%-৯০% শিক্ষার্থীকে যে সকল শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন বা পাঠ দান করেন তাদের বেতন-ভাতা ও প্রাসঙ্গিক সুবিধার এ কতটা ব্যয় হয়? বর্তমান জীবন যাত্রার সকল দিক বিবেচনাপূর্বক শিক্ষকদের এ দুরবস্থার অবসান অত্যন্ত জরুরী।

২। প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে আন্তর্জাতিক মানকে দেশীয় প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় এনে প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে (ছাত্রছাত্রী অনুপাতে) শিক্ষকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে মানসম্মত পাঠ দানের ক্ষেত্রে প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১জন শিক্ষক দেয়া উচিৎ, সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিটি কলেজে বিষয়ওয়ারী ১জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়ে পড়ছেন। ক বছর পূর্বেও ১২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১জন এবং ১২৫-এর অধিক শিক্ষার্থীর জন্য ২ জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হওয়ার বিধান চালু ছিল। যেখানে শিক্ষার মানের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক না বাড়িয়ে বরং কমানো হয়েছে। শিক্ষার্থীর অনুপাতিকহারে শিক্ষকের অভাবে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে ইংরেজী, বাংলা বিষয়টির ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। কোন কোন বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীধারী শিক্ষকও পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় শিক্ষার্থীর শিক্ষক সংকটে পড়েছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি, বিষয় এবং সিলেবাসের ব্যাপকতাসহ নানা কারণে একজন শিক্ষার্থী কোন না কোন পাবলিক পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণী পাওয়াটা স্বাভাবিক। একজন শিক্ষক কেবলমাত্র সার্টিফিকেট সর্বস্ব নয়, তার থাকা চাই বিবিধ যোগ্যতা। তাই শিক্ষক জীবনে বেশী না হোক কমপক্ষে ১টি ৩য় বিভাগ থাকলেও শিক্ষার স্বার্থে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ থেকে আইনীভাবে তাকে দূরে রাখা ঠিক হবে না। তাতেও মফস্বল পর্যায়ে কিছুটা শিক্ষক সংকট ঘুচবে।

৩। বর্তমানে প্রচলিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তা শিক্ষার মান পরিপন্থী যা সংশোধন আবশ্যক। নীতিমালা মোতাবেক ৭৫% উপস্থিতিসহ কমপক্ষে ৪৫% নম্বর স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পেতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে প্রায় সকল ছাত্রীর বেলায় এ শর্তের অভাব পূরণ করে দিয়ে উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল এবং উপস্থিতির হার দেখাতে হয় তা না হলে নাম কর্তনেই টাকা, ফলাফল এবং উপস্থিতি দূরে থাক। মফস্বল পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকা পাওয়া থেকে কোন ছাত্রী বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চরম অবস্থা হয়ে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবে সকলের টাকা উঠাতে হয়।

৪। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুনভাবে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পরিবর্তিত বই ও সিলেবাসের উপর শিক্ষকদেরকে পাঠদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক শিক্ষার্থীদের মাঝে চালু করলেই শিক্ষাদানে ত্রুটি ও ঘাটতি অনেকটাই নিরসন হবে এবং পরিবর্তিত সিলেবাসের সুফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

৫। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান আবশ্যক। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং শিক্ষা উপকরণ তথা শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা যেহেতু এক নয়, কাজেই (একজনকে চেক দিলে আরেকজনকেও চেক দিতে হবে তা পরিহার করে) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম/পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিরূপণ করেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা প্রদান করা উচিত। যেমন যে ভবন জরুরী দরকার ভবন, যেমনিভাবে মাঠ, লাইব্রেরী, শিক্ষা উপকরণ এবং ছাত্রাবাস তথা শিক্ষার স্বার্থে যার যা জরুরী প্রয়োজন তা বিবেচনায় এনে রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের ভিত্তিতে তাহাই সমাধান করতে হবে।

৬। শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে যে সকল শিক্ষক জাতীয়ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরপেক্ষতার নীতিতে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে মনে করি। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত নীতিমালা অনুসরণ না করলে শিক্ষা কার্যক্রম এগোতে পারে কি?